মাতৃমনন

মানবজাতির চিরন্তন আদর্শ : সারদা দেবী

প্রব্রাজিকা নির্বেদপ্রাণা

আদর্শ বলতে আমরা ঠিক কী বুঝি? আদর্শ হল একটি মানদণ্ড যার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নিজেদের মূল্যায়ন করতে পারি, অথবা যেগুলিকে আমরা জীবনে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করি। এদের মধ্যে কতগুলির মূল্য চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়; সেগুলিকে আমরা প্রাচীনও বলি না, আধুনিকও বলি না। সেসব আদর্শ কালাতীত। আর এই সবগুলিকে একত্রিত করলে আমরা তিনটি প্রধান মূল্য পাই—সত্য, শিব ও সুন্দর।

এই তিনটি আদর্শ মানবজীবনের তিনটি দিকের সঙ্গে প্রধানত যুক্ত। সত্যের সঙ্গে যুক্ত জ্ঞান। সত্য আমাদের যথার্থ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত রাখে। শিব যুক্ত থাকে আমাদের কর্মের সঙ্গে। শিব বা কল্যাণের আদর্শ আমাদের কর্মকে কল্যাণমুখী করে। সুন্দরের যোগ অনুভূতির সঙ্গে। সুন্দর আমাদের অনুভূতিগুলিকে সরস রাখে। সত্য, শিব, সুন্দর এই তিনটি আদর্শের আলোয় আমরা শ্রীমা সারদা দেবীর জীবনকে দেখার চেষ্টা করব।

আমরা দেখি, স্বার্থশূন্যতা, সহনশীলতা, ঔদার্য, মহত্ত্ব—যতরকম মানবিক আদর্শ আছে সবকিছুরই আদর্শ মায়ের জীবন। মা সত্যস্বরূপিণী ছিলেন। প্রখর বিচক্ষণতায় তিনি সবসময় যা ন্যায়, যা ধ্রুব তাকেই ধরে থেকেছেন। তিনি করুণাময়ী হলেও তাঁর করুণা কখনও মিথ্যার সঙ্গে আপস করেনি। পরম দীনতায় অথচ চরম দৃঢ়তায় তিনি মিথ্যার প্রতিবাদ করে সত্যে স্থির থাকতেন। সেযুগ অসম্ভব গোঁড়া, সংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু মায়ের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ধরা পড়ত কোনটি যথার্থ এবং কোনটি অহেতুক। অহেতুক বাহুল্য মানুষকে শুধু পীড়ন করে। সে-সময়ের দেশাচার অনুযায়ী বিধবারা খুব কৃচ্ছ্রতা করতেন। মা কিন্তু এটি প্রশ্রয় দেননি। মা বুঝতেন, নীতিশাস্ত্র মেনে, অনুশাসন বা আইন করে প্রবৃত্তিকে রুদ্ধ করা যায় না। বালবিধবা ক্ষীরোদবালা দেবীকে তাই মা বলেছেন, ''বাছা, অনেক কঠোর করেছ; আমি বলছি, আর করো না।'' শবাসনা দেবীকে নিরম্বু উপবাসে উন্মুখ দেখেও মা বলেছিলেন, ''আত্মাকে কষ্ট দিয়ে কি হবে। আমি বলছি তুই জল খা।''[১] বালবিধবাদের মাছ দেওয়া নিয়ে একজন প্রশ্ন করলে মায়ের উত্তর ছিল : ''ওদের আকাঙ্ক্ষা থাকে কিনা, না দিলে চুরি করে খাবে। যখন বুঝবে এটা সমাজবিরুদ্ধ তখন ছেড়ে দেবে।'' মা সরল কথায় বুঝিয়ে দিতেন, ঈশ্বরলাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য।

কৃচ্ছ্রতা করে দেহ নষ্ট হয়ে গেলে সেই উদ্দেশ্যই সাধিত হবে না।

বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা সত্ত্বেও সেকালের অন্যতম বুদ্ধিজীবী, ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন নিজের অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহ দেন কুচবিহারের রাজপরিবারে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর মেয়েদের বাল্যকালেই বিবাহ দেন। মেয়েদের পক্ষে লেখাপড়া শিখে অবিবাহিত জীবনযাপন তখন কল্পনাতীত ছিল। অথচ এক মহিলা যখন তাঁর মেয়েদের বিয়ে দিতে পারছেন না, তখন তাঁকে শ্রীশ্রীমা বলছেন, ''বে দিতে না পার, এত ভাবনা করে কি হবে? নিবেদিতার স্কুলে রেখে দিও—লেখাপড়া শিখবে, বেশ থাকবে।''[২]

সেযুগে জাতিভেদপ্রথা ছিল ভয়ানক। কিন্তু জাতপাতের গোঁড়ামিকে শ্রীশ্রীমা কখনও আমল দেননি। পালকি-বেহারার ছেলে শান্তিরামকে মা মুখে ভাত দেন, রুপোর বালা গড়িয়ে দেন। তাঁর স্মৃতি : ''পিসিমার ভালবাসার কথা ভোলা যাবে না। ছোটজাতকে পিসিমা কখনো ছোট করে দেখেননি। দুলে, বাগদি, বারুই, ডোম সবাই নিঃসঙ্কোচে পিসিমার বাড়িতে যাতায়াত করত... ভালবাসার টানে যেত। সেযুগে বামুনদের বাড়ির ছাঁচতলায় ঢোকার অধিকার আমাদের ছিল না। জয়রামবাটীর বামুনরাও আমাদের ছোঁয়া থেকে শত হাত দূরে থাকত। সেযুগে জয়রামবাটীর বুকে আমরা পিসিমার একেবারে কাছে যাওয়ার অবাধ অধিকার পেয়েছি। পিসিমা আমাদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন। নীচু জাতের লোকেদের নিজের হাতে পরিবেশন করে খাইয়েছেন, এমনকি উচ্ছিষ্টও পরিষ্কার করেছেন। এইজন্য গাঁয়ের মোড়লরা, বামুনরা তাঁকে একঘরে করে দেবার হুমকি দিয়েছেন বারবার, জরিমানা করেছেন। কিন্তু পিসিমা কোন কিছুকেই গ্রাহ্য করেননি।''[৩] দরিদ্র মুসলমানের ঠাকুরের জন্য আনা কলা মা সাগ্রহে নিয়েছেন। সমাজের চোখে ম্লেচ্ছ মেয়ে নিবেদিতা ঠাকুরকে রান্না করে ভোগ দিলে সে-প্রসাদ নিজে গ্রহণ করেছেন।

মানবিক দৃষ্টিতে যা সহজ, সরল, সত্য তাকেই মা প্রকাশ করে গেছেন আজীবন। সত্য ও ন্যায়ে অবিচল ছিলেন বলেই তাঁর প্রতি কর্ম, প্রতি চিন্তা, প্রতি আচরণ ছিল কল্যাণমুখী। তাঁর কাছে যারা আসতেন তাঁদের ঐহিক অভাব দূর করার দিকে যেমন তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকত, তেমনই জানা-অজানা সকল সন্তানের আধ্যাত্মিক কল্যাণেরও পূর্ণদায়িত্ব নিতেন তিনি। অবলীলায় তাঁদের ভববন্ধনমোচনের ভার নিতেন। শৈশব থেকেই তাঁর কল্যাণীরূপটি আমরা দেখতে পাই—ভাইবোনদের দেখাশোনায়, দুর্ভিক্ষের সময় বুভুক্ষুদের খিচুড়ি ঠান্ডা করার জন্য বাতাস করায়। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাগবতী তনুর সেবাও সহজ ছিল না। দ্রব্যদোষ, স্পর্শদোষ সব বাঁচিয়ে তাঁর সমাধিপ্রবণ মনকে ভাবরাজ্য থেকে নামিয়ে খাওয়ানোর মতো দুরূহ কাজ একমাত্র মা-ই করতে পারতেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ভক্ত, সন্তান, অতিথিদের আনাগোনার শেষ ছিল না—সময়েরও ঠিক ছিল না। তাদের আদরযত্ন ও আতিথেয়তার কোনও ত্রুটি যাতে না হয় সেদিকেও মায়ের সদাসতর্ক দৃষ্টি ছিল। ঠাকুরের অসুস্থতার সময় মা নিজের সুখসুবিধা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে তাঁর সেবা করেছেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর এক বিচিত্র পরিমণ্ডলে তাঁকে দেখা যায়। একদিকে ভাইদের অদ্ভুত সংসার, অন্যদিকে ত্যাগী সাধুরা, ভক্ত নারীপুরুষ। সাধু, ভক্ত, দরিদ্র, রোগী, শোকার্ত, যে-কোনওভাবে বিপন্ন—যার যা সমস্যা, মা তার সমাধান করে চলেছেন। উদ্বোধনের কর্মচারী চন্দ্রমোহন দত্তের ঘরবাড়ি পদ্মার বন্যায় ভেসে গেছে। অসহায় নিরাশ্রয় চন্দ্রের বাড়ি তৈরির খরচ, যাতায়াতের খরচ—সব মা দিলেন, কাউকে কিছু না জানিয়েই। দেশড়ার বৃদ্ধ হরিদাস বৈরাগী

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রচণ্ড বস্ত্রাভাবের সময় মায়ের নতুন কাপড় পেয়ে অভিভূত হয়েছেন। আর ছিল খুড়ো নীলমাধবের সেবা, সর্বোপরি রাধুর সেবা। খোসপাঁচড়ায় মৃতপ্রায় রাখাল ছেলের যে-শুশ্রূষা তিনি করেছেন তা নিজের জননীর সেবাযত্নকেও হার মানায়। আবার পুত্রহারা মাঝি-বউয়ের শোক নিজের মধ্যে টেনে নিয়েছেন। তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে মায়ের আকুল কান্না দেখে সকলে আশ্চর্য হয়ে ভেবেছেন, এদের মধ্যে কে সন্তানহারা! বিদেশিনীর অসুস্থ মেয়েকে ঠাকুরের প্রসাদি ফুল দিয়ে সুস্থ করেছেন। আর্তি যেখানে যথার্থ সেখানে মায়ের করুণাধারা শতধারে প্রবাহিত হয়েছে। এরকম কত শত ঘটনা তাঁর জীবনালেখ্যে যে ছড়িয়ে আছে!

মমতাময়ী এই কল্যাণরূপিণী একইসঙ্গে সকলের পারমার্থিক কল্যাণের ভার নিজহাতে তুলে নিয়েছিলেন। অবতারপুরুষের 'শক্তি' তিনি, কটাক্ষে পূর্ণজ্ঞান দিতে পারেন। অনায়াসে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আরব্ধ কাজের ভার সম্পন্ন করেছেন। মানুষকে মুক্তিপথের সন্ধান দিচ্ছেন। নিশিকান্ত মজুমদারকে দীক্ষা দেওয়ার পর বলেছেন, ''একশো আট মন্ত্র জপ করবে। আর তোমাকে কিছুই করতে হবে না। বাকি সব আমিই করব। বাবা, কত জন্ম-জন্মান্তর ঘুরছ। ঘুরতে ঘুরতে এতদিনে ঘরের ছেলে ঘরে এসে পৌঁছেছ। আর ভাবনা কি?" সুরেন্দ্রনাথ সরকারকে বলেছেন, ''(সাধনভজন) কি আর করবে, যা করছ তাই করে যাও। মনে রাখবে, তোমাদের পেছনে ঠাকুর আছেন—আমি আছি।"[৪] একদিন একজন ভক্তমহিলা মাকে বললেন, ''মা, আমরা তো সারা দিনরাত সংসার নিয়ে সংসারের সকলের ফরমাস আর চাহিদা মেটাতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। সারা দিন-রাতে পাঁচটা মিনিটও ঠাকুরকে ডাকতে সময় পাই না। আমাদের কী হবে মা? আমাদের ওপর কি তাঁর দয়া হবে না?" মা বললেন, ''নিশ্চয়ই হবে মা। তিনি তো অন্তর্যামী। সবার বুকের মাঝে তিনি সবসময় আছেন। তোমার ভিতরে আকুতি থাকলে তা তিনি বুঝবেনই বুঝবেন। তাছাড়া সংসারের কাজ কি তোমরা কর মা? তিনিই করান। এ সংসার তো তাঁরই। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কি কিছু হয় মা? তাঁর ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটিও নড়ে না।... তোমার মধ্যে এই যে ব্যাকুলতাটা এসেছে, জানবে তাঁর ইচ্ছাতেই এসেছে। যে তাঁকে ভালবাসে, তাকে তিনি রক্ষা করেন। তাঁকে ভালবাস আর নাই বাস, তিনি তোমাকে ভালবাসেন। সংসারে সাধুও আছে আবার গৃহীও আছে। তবে গৃহীর জন্যই তিনি বেশি ভাবেন। সাধু তো তাঁকে ডাকবেই, কিন্তু গৃহীর যে পিঠে বিশমণ বোঝা, ঠাকুর বলতেন। তাই গৃহীর জন্যই তাঁর চিন্তা বেশি। শুধু একটু স্মরণ মনন করলেই হলো। মনে-প্রাণে ব্যাকুলভাবে তাঁকে ডাক। তাঁর স্মরণ-মনন কর। দিনান্তে দুফোঁটা চোখের জল ফেলে তাঁর নাম কর। ঐ দুফোঁটা চোখের জল ছাড়া তোমাদের কি-ই বা আছে বল? আর সবই তো তাঁর। ঐ দুফোঁটা জল শুধু তোমার। ওটুকুই তাঁকে দিও। তোমাদের কাছে বাঁধা হয়ে থাকবেন তিনি। ভয় কি মা, ঠাকুর এসে এবার তোমাদের জন্য ভগবানকে পাওয়ার এই সহজ পথ বলে দিয়ে গিয়েছেন।"[৫]

এই কল্যাণময়ী রূপের সঙ্গে আর একটি রূপ মায়ের জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেটি তাঁর সুন্দরতম রূপ। সৌন্দর্যের আদর্শ সাকার রূপ ধরেছিল তাঁর মধ্যে। একবার এক ভক্ত গোকুল দাস বাগবাজারের গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে চণ্ডীর শ্লোক আবৃত্তি করছিলেন। মা তখন সেখানেই ঘাটের সিঁড়ির সবচেয়ে নিচু ধাপে বসে জপ করছিলেন। ভক্ত এত মৃদুকণ্ঠে পাঠ করছিলেন যে, কেবল তাঁর নিজের কানেই গুনগুন শব্দ আসছিল। স্তবের 'সৌম্যাসৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী'

এই অংশটি পাঠের সময় মা পিছনে ঘুরে তাকান, তাঁকে হাত তুলে আশীর্বাদ করে আবার জপে ডুবে যান। চণ্ডীর এতবড় স্তবের কোন অংশে মা সাড়া দিলেন?—তিনি সৌম্যা, অসৌম্যতরা, সুন্দরী হতেও সুন্দরী, অতিসুন্দরী। মার সত্তা সৌন্দর্যময়, সৌম্য। বলা বাহুল্য এ-সৌন্দর্য কেবল দৈহিক সৌন্দর্য নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, ''রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধদৃষ্টিতে দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবারে রূপ ঢেকে এসেছে।''

মায়ের সৌন্দর্য এবারে তাঁর আনন্দময় করুণাময় মূর্তির মধ্য দিয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি আনন্দময়ী ছিলেন। ঠাকুরের সম্বন্ধে যেমন নিজে মন্তব্য করেছেন, ''তাঁকে কখনও নিরানন্দ দেখিনি'', সেই একই কথা তাঁর নিজের সম্পর্কেও সত্য। অথচ কত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মা থেকেছেন। বাহ্যদৃষ্টিতে অসুবিধা আর অস্বাচ্ছন্দ্য তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিল। গ্রামাঞ্চলের খোলামেলা মুক্ত প্রকৃতিতে বড় হয়েছেন তিনি, অথচ দক্ষিণেশ্বরে—অতিক্ষুদ্র বদ্ধ তাঁর থাকার ঘর, তাও চারদিক দরমার বেড়া দিয়ে আটকানো, কথা বলারও সঙ্গী নেই তেমন, স্বামীর কাছে যাওয়ার সুযোগ নেই—তারই মধ্যে পরিশ্রমেরও কিছু খামতি নেই। আপাতদৃষ্টিতে মায়ের তৎকালীন জীবনযাপন মোটেই সুখকর ছিল না অথচ সেই সময়ের স্মৃতিচারণ করে তিনি আনন্দে ভরপুর হয়ে যেতেন। হৃদয়ে আনন্দের পূর্ণঘট সত্যি-সত্যিই বসানো আছে, অনুভব করতেন। আমরা সংসারে কাছের মানুষদের অথবা প্রতিবেশীর আত্মকেন্দ্রিক আচরণ দেখলে সহ্য করতে পারি না, কখনও সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠি, কখনও বা মর্মাহত হই। মাকে এর চেয়েও মন্দ পরিবেশে নিত্যদিন থাকতে হয়েছে অথচ সমালোচনা তো দূরের কথা, বলতেন, ''আমি অশান্তি বলে তো কখনো কিছু দেখলুম না।''[৬] মনের গভীরেও কোনও অশান্তি, নিরানন্দের ছায়া রেখাপাত করত না। কী করে এমন সম্ভব হয়েছিল? কারণ তাঁর ছিল এক আশ্চর্য নির্লিপ্তি। সংসারে থেকেও এমন উঁচু তারে মন বেঁধে রাখতেন, আনন্দময় স্বরূপের সঙ্গে এমনভাবে একাত্ম থাকতেন যে দুঃখ তাঁকে স্পর্শ করতে পারত না।

মা শুধু আনন্দরূপিণী ছিলেন না, ছিলেন আনন্দদায়িনী। এই আনন্দদায়িনী রূপের প্রকাশ ঘটেছিল করুণায় আত্মহারা মাতৃমূর্তিতে। আশ্চর্য চরিত্র মায়ের। জ্ঞানসূর্যের আলোয় তিনি প্রজ্ঞায় স্থির আবার প্রেমচন্দ্রের আলোয় মমতায় কোমল। এক অপার্থিব ভালবাসায় তিনি পূর্ণ থাকতেন সবসময়। এমনই সেই ভালবাসা—যা আবেগ-উচ্ছ্বাসহীন অথচ আলো-হাওয়ার মতো স্বাভাবিকভাবে মানুষকে সজীব রাখে। এই ভালবাসার প্রেরণাতেই তিনি ধর্মভেদ, জাতিভেদের গণ্ডি অতিক্রম করেছিলেন, এই প্রেমেই তিনি সকলের সেবা করে গেছেন, সকলকে আপন করে টেনে নিয়েছেন। নিজের এই মাতৃসত্তার গভীরতাকে অনুভব করতে পারতেন বলেই শত শত ভক্ত তাঁকে মা বলে ডেকে তৃপ্ত হয়েছে, নিশ্চিন্ত হয়েছে, পরিপূর্ণ হয়েছে। এক সন্তান আবেগে আপ্লুত হয়ে বলেছেন, ''... কে জানত যে মা এরকম মা—এ রকম করে মন প্রাণ কেড়ে নিয়ে আপনার হতেও আপনার করে নেবেন।... বাড়ির মাকেও তো খুব ভালবাসতুম, তিনিও কত ভালবাসতেন, কিন্তু এ যে জন্মজন্মান্তরের চিরকালের আপনার মা!''[৭]

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অনেকেই তাদের গর্ভধারিণী জননীর আপন সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। মায়ের অন্যতম সেবক স্বামী সারদেশানন্দ এমন একটি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছিলেন। বেলুড় মঠে মায়ের মন্দিরে মায়ের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে একটি ছোট মেয়ে একবার ছবির মায়ের দিকে আর একবার নিজের মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তার মাকে প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল : ''মা, এ-ফটো

তোমার কি না বলো, ঠিক করে বলো এ-ফটো তোমার কি না।" মন্দিরে শোভিত শ্রীমায়ের ছবিকে তার নিজের মায়ের ছবি বলেই মনে হয়েছে। সারদেশানন্দজী লিখেছেন, "... এই মা-ই তো সকল মায়ের অন্তরে।"[৮]

কী অপরিসীম কোমল মাতৃভাব তাঁর! যেন সন্তানের শত অপরাধ ক্ষমা করে ক্লান্ত, শ্রান্ত তাকে বুকে টেনে নেওয়ার জন্যই তিনি বসে আছেন। এই মাতৃসত্তাতেই তাঁর ভালবাসা মানবিক ভালবাসাকে অতিক্রম করে ঐশী ভালবাসাতে পৌঁছে গিয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব মানুষ এবং ভগবানের ভালবাসার তফাত করতে গিয়ে নিরঞ্জনানন্দজীকে বলেছিলেন, "তুই যদি সংসারীর নিরানব্বইটি উপকার করিস আর একটা অপকার করিস, তবে লোকে আর তোকে দেখতে পারবে না। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে তুই যদি নিরানব্বইটি অপরাধ করিস আর একটা তাঁর প্রীতির কাজ করিস, তাহলে তিনি তোর সব অপরাধ মার্জনা করবেন। মানুষের ভালবাসা আর ঈশ্বরের ভালবাসায় এতটাই তফাত জানবি।" এই উক্তির আলোতেই আমরা মায়ের ঐশী ভালবাসার স্বরূপ জানতে পারি। তিনি বাহ্যদৃষ্টিতে সন্তানের জননী না হয়েও কোথা থেকে পেয়েছিলেন এমন ক্ষমা, এমন অদোষদর্শী দৃষ্টি? এই ভালবাসাতেই তিনি সর্বস্তরের সব জাতের সন্তানের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করে বলতে পারেন, "ছত্রিশ কোথায়, সব যে আমার!" এই আপনকরা প্রেমে মানুষ নিজে যেমন শান্তিতে, আনন্দে থাকে, অপরকেও আনন্দে রাখে। মা-ই তার মূর্ত প্রমাণ। জগতের প্রতি তাঁর অন্তিম আবেদন বা নির্দেশ ছিল : "কারো দোষ দেখো না, দোষ দেখবে নিজের। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।"

দেবী সারদা এভাবেই জগদানন্দদায়িনীরূপে প্রকাশিত হয়েছেন, তাঁর প্রেমপ্রবাহকে বহুমুখী করে বহুর কল্যাণে প্রসারিত করেছেন এবং সর্বভূতে একই চৈতন্য—এই অদ্বৈতজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থেকে সকলের প্রতি পক্ষপাতহীন ভালবাসায়, সত্যে, ন্যায়ে অবিচল থেকেছেন। তিনি সত্যস্বরূপিণী, কল্যাণময়ী, আনন্দদায়িনী। বাস্তবিকই মানবজাতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ, যা কিছু সুন্দর গুণ তার সবগুলি আমরা ওই একটি জীবনালেখ্যে খুঁজে পাই। মা সারদা যেন মানবজাতির চিরন্তন আদর্শের পরাকাষ্ঠা হয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর দিব্যজীবনের শুধুমাত্র অনুধ্যানেই আমাদের মনের অনেক মালিন্য কেটে যায়; আর সে-জীবনের অনুসরণ আমাদের পরমশান্তির পথে নিয়ে চলে। তিনি আমাদের সত্য, জ্ঞান এবং আনন্দের পথে—সত্য-শিব-সুন্দরের পথে নিয়ে চলুন এই আমাদের আকুল প্রার্থনা। 'সত্যজ্ঞানানন্দাদিলক্ষণা' এই দিব্য মাতৃমূর্তিকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম। ✠

তথ্যসূত্র

১। দ্রঃ স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীমা সারদা দেবী* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা ২০০১), পৃঃ ৩৬০

২। তদেব, পৃঃ ৩৬২

৩। সংকলক ও সম্পাদক : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, *শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১১), খণ্ড ৩, পৃঃ ৬৯৯ [এরপর, *পদপ্রান্তে*]

৪। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, *চিরন্তনী সারদা* (উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৭), পৃঃ ১৯ [এরপর, *চিরন্তনী সারদা*]

৫। *পদপ্রান্তে*, পৃঃ ৬৮৯-৯০

৬। *শ্রীশ্রীমায়ের কথা* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১২), অখণ্ড, পৃঃ ৩৮

৭। দ্রঃ সম্পাদনা : স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, *শতরূপে সারদা* (রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার : কলকাতা), পৃঃ ২০৬

৮। *চিরন্তনী সারদা*, পৃঃ ২৮